জিহাদ কেন প্রয়োজন ??!!

লেখক আবূ কাতাদাহ আল ফিলিস্তিনী

بسم الله الرحمن الرحيم

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন পৃথিবী সৃজনের বহু পূর্বেই অত্যন্ত সুন্দর ও শ্রেষ্ঠাআকারে মানুষ সৃষ্টি করে পৃথিবীতে পাঠানোর বিষয়টি লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। আল্লাহ তা'লা বলেন- "আর অবশ্যই আমি মানুষকে অতি সুন্দর গঠনে সৃষ্টি করেছি।" সুতরাং এক্ষেত্রে তিনি তাঁর স্রষ্টার মহিমা গেঁথে দিয়ে মহা আমানতের দায়িত্বভারটি মানুষের উপর ন্যস্ত করেছিলেন। এরশাদ করেছেন- "নিশ্চয় আমি আমানত বিষয়টি নভোমন্ডল-ভূমন্ডল এবং পাহাড়-পর্বতের কাছে পেশ করেছি, তারা (দায়িত্বের সঠিক ব্যবহারে সক্ষম হবেনা) ভয়ে তা বহন করতে অপারগতা প্রকাশ করেছে। পরিশেষে মানুষ তা বহন করার সাহস করেছে, আর বস্তুতই মানুষ বড় জালেম ও গন্ডমুর্খ।" উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক 'আমানত' বহনের দায়ে মানুষকে জালেম ও মুর্খ বলে আখ্যায়িত করেননি; বরং এ মহা আমানতের মূল্যবোধ না থাকা এবং এক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র অলসতার কুপরিণামের কথা চিন্তা না করার দরুণ মানুষকে জালেম ও মুর্খ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'লা যমিন-আসমানের সবকিছু অনুকূলে করার মাধ্যমে আদমসন্তানের গলায় সম্মানের মালা পরিয়েছেন। এরশাদ করেছেন- "তোমরা কি ভেবে দেখনা যে, আল্লাহ নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সকলকিছুকে তোমাদের অনুকূলে করে দিয়েছেন, তোমাদের উপর বাহ্যিক-আভ্যন্তরীণ সকল নেয়ামেরত সমাবেশ ঘটিয়েছেন।" অন্যত্র এরশাদ করেছেন- "যমিন আসমানের সকল বস্তুকে আল্লাহ তোমাদের জন্য পরিচালিত করেছেন, নিশ্চয় এক্ষেত্রে চিন্তাশীলদের জন্য ভেবে দেখার বিষয় রয়েছে।" সুতরাং আল্লাহ তা'লা সবকিছু মানুষের সেবা ও সুখের জন্যই সৃষ্টি করে মানুষকে শুধুমাত্র তাঁর এবাদতের জন্য নির্ধারিত করেছেন। এরশাদ করেছেন- "আমি জ্বিন-ইনসানকে কেবল আমার এবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। তাদের কাছে আমি কোন রিযিক চাইনা; এটাও চাইনা যে, তারা আমার জন্য খাবার জোগাড় করুক। কেননা, আল্লাহ তা'লাই হচ্ছেন একমাত্র রিযিকদাতা, মহাপরাক্রমশালী।"

পৃথিবীর বুকে পাঠানোর পূর্বে আল্লাহ তা'লা মানুষদের থেকে এই বলে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো এবাদত করা যাবেনা। কুরআনে কারীমে এরশাদ হয়েছে- "স্মরণ কর ঐ সময়ের কথা, যখন তোমার প্রভু সকল আদম সন্তানকে সামনে রেখে তাদের কাছ থেকে এই বলে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, আমি কি তোমাদের প্রভু নই ?! অতপর আদমসন্তানকূল একবাক্যে বলে উঠেছিল যে, হ্যাঁ..! আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অবশ্যই আপনিই আমাদের প্রভু! (প্রতিশ্রুতিটি এজন্যই নিয়েছিলেন) যাতে বিচারদিবসে কেউ বলবে না পারে যে, আমরা এথেকে সম্পূর্ণ অমনযোগী ছিলাম বা আমাদের বাপদাদাগণ ইতিপূর্বে শিরকে লিপ্ত ছিল, যারফলে আমরাও তাদের দেখাদেখি শিরকে লিপ্ত হয়েছি। অপরাধীদের কর্মকান্ডের দরুণ আপনি কি আমাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন ?!

ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. হযরত আনাস বিন মালিক রা. থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন, যেখানে নবী করীম সা. বলেন যে, জাহান্নামবাসীকে কেয়ামতের দিন বলা হবে- "মনে কর যে, পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তোমাকে দিয়ে দিয়ে হল, তাহলে আজ তুমি এসবকিছুই জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দেবেনা?! সে বলবে- বলবে অবশ্যই সব দিয়ে দেব। তখন আল্লাহ তা'লা বলবেন- দুনিয়াতে আমি তোমার থেকে ছোট্ট একটি বিষয় আশা করেছিলাম। সমস্ত আদমসন্তানের সামনে তোমার থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে, আমার সাথে কাউকে শরীক করবেনা। কিন্তু দুনিয়াতে তুমি তা না করে শিরকে লিপ্ত হয়েছ।"

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন- "আরাফার দিন আদম আ.এর পৃষ্ঠদেশ থেকে আল্লাহ পাক দুটি প্রতিশ্রুতি নিলেন। অতপর আদম আ.এর ঔরস থেকে সৃষ্ট হওয়া সকল বনী আদমকে বের করে তার সামনে রাখলেন। অতপর আল্লাহ তাদের সাথে কিছু কথা বললেন। আল্লাহ তালা তখন বললেন- আমি কি তোমাদের প্রভু নই ?!! তা শুনে সকল আদম সন্তান একবাক্যে বলে উঠল- হ্যাঁ!! আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অবশ্যই আপনি আমাদের প্রভূ।

এবাদতের ক্ষেত্রে মানুষকে আল্লাহ পাক দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। প্রথম শ্রেণীর লোকেরা উপরোক্ত প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ রেখে আল্লাহর এবাদতে মগ্ন থাকবে। অপর শ্রেণী প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গিয়ে অন্যায় অত্যাচার পাপাচারে লিপ্ত হবে। মানুষকে পূণরায় তাদের প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেবার নিমিত্তে আল্লাহ পাক লাখো নবী-রাসূল ও অগণিত আসমানী কিতাবাদী অবতীর্ণ করেছেন। কোরআনে কারীমের ভাষায়- "আর প্রেরণ করেছি সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে অসংখ্য নবী-রাসূল, যেন (বিচারদিবসে) আল্লাহ পাকের সামনে তাদের কোন কারণ দর্শানোর সুযোগ না থাকে, বস্তুতই আল্লাহ পাক পরাক্রমশালী ও মহাপ্রজ্ঞাময়।"

উক্ত প্রতিশ্রুতি সম্বলিত আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত তাফসীর বিশারদ উবাই বিন কা'ব রা. বলেন যে, আল্লাহ পাক বলেছেন- "নিশ্চয় আমি আসমান ও যমীনকূলকে সাক্ষী রাখলাম এবং তোমাদের পিতা আদমকেও সাক্ষী রাখলাম, যাতে কেয়ামতের দিন তোমরা একথা বলতে না পার যে, আমরা ঐ প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলাম। তোমরা ভাল করে স্মরণ রেখো যে, আমি ছাড়া কোন খোদা নেই, আমি ছাড়া কোন প্রভূ নেই। সুতরাং আমার সাথে কাউকে অংশীদার করোনা। আর এ প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য অবশ্যই দুনিয়াতে আমি তোমাদের কাছে আমার অনেক প্রতিনিধি প্রেরণ করব, অনেক কিতাবাদী নাযিল করব। তখন আদমসন্তানকূল বলে উঠেছিল- আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয় আপনিই আমাদের রব আপনিই আমাদের একমাত্র প্রভূ। আপনি ছাড়া আমাদের কোন প্রভূ নেই। আপনি ছাড়া আমাদের কোন আশ্রয়স্থল নেই।" সুতরাং ঐদিন সকলেই আল্লাহ পাকের হুকুম মানার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। অতপর আল্লাহ পাক আদম আ.কে উঠালেন। আদম আ. নিজ সন্তানদের মাঝে ধনি-গরিব, সুশ্রী-কুশ্রী ভেদাভেদ দেখে আল্লাহর কাছে আরয করলেন- হে আল্লাহ! আপনার বান্দাদের মাঝের এই ভেদাভেদগুলো যদি মিটিয়ে দিতেন! আল্লাহ পাক উত্তরে বলেছিলেন- আমি চাই যে, তারা আমার কৃতজ্ঞতা আদায় করুক! সন্তানদের এই ভীড়ে হযরত আদম আ. নবীদেরকে উজ্জল বাতির মত অবলোকন করেছিলেন, মনে হচ্ছিল তাদের মাথার উপর নূর চমকাচ্ছে।

আল্লাহ পাক জান্নাতকে আনুগত্যশীল বান্দাদের ঠিকানা আর জাহান্নামকে দাম্ভিক বান্দাদের শেষ পরিণাম রূপে নির্ধারণ করেছেন। কুরআনে কারীমে বর্ণিত হয়েছে- "আর যারা আল্লাহর আহবানে সাড়া দিল, তাদের জন্য থাকবে উত্তম পরিণাম। পক্ষান্তরে যারা সাড়া দেয়নি, তারা যমিন ও

আসমানের মধ্যবর্তী সকল কিছুকেও যদি সেদিন মুক্তিপণ হিসেবে পেশ করে, কখনো তা তাদেরকে কুপরিণাম হতে রক্ষা দেবেনা। তাদের জন্যই রয়েছে কঠিন হিসাব। তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। কি নিকৃষ্ট তাদের পরিণামস্থল!!

ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. হযরত আনাস বিন মালিক রা. থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন, যেখানে নবী করীম সা. এরশাদ করেছেন যে, বিচারদিবসে জাহান্নামের সর্বনিম্নমানের শাস্তিপ্রাপ্ত লোকদের একজনকে সম্মোদন করে আল্লাহ পাক বলবেন- পৃথিবীতে যা কিছু ছিল, সবকিছুই যদি তোমাকে দিয়ে দেয়া হয়, তাহলে এই শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য তুমি কি সবকিছু মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দেবে ?? সে বলবে- অবশ্যই সব দিয়ে দেব। তখন আল্লাহ পাক বলবেন- আমি তোমার কাছ থেকে এথেকেও ছোট্ট একটি বিষয়ের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম -যখন তুমি আদমের ঔরসে ছিলে- যে, আমার সাথে তুমি কাউকে অংশীদার করবেনা। কিন্তু তুমি সে প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে আমার অংশীদার সাব্যস্ত করেছ!!"

আল্লাহ পাক বলেন- "আর যে ব্যক্তি জানে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে সবি সত্য, সে কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে নাকি অন্ধ ?!! বস্তুত সেসব জ্ঞানবানরাই একমাত্র উপদেশ গ্রহণ করে থাকে- যারা আল্লাহকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করে, কখনো তা ভঙ্গ করেনা, যারা আল্লাহর আদেশকৃত বন্ধনগুলো ঠিক রাখে, স্বীয় প্রভুকে ভয় করে, কঠিন হিসাবের শংকা মাথায় রাখে, যারা একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্টির আশায় ধৈর্য্য ধারণ করে, নামায কায়েম করে, আমি যে রিযিক তাদের দিয়েছি তাথেকে গোপনে প্রকাশ্যে খরচ করে, যারা মন্দকাজকে সৎকাজের দ্বারা রূপান্তরিত করে, একমাত্র তাদের জন্যই রয়েছে শুভপরিণাম জান্নাতে আ'দন, সেখানে তারা প্রবেশ করবে, সাথে থাকবে তাদের ন্যায়বান পিতা, স্ত্রী, আর সুসন্তান। ফেরেশতাগণ তাদের কাছে প্রবেশ করবে সকল দরজা দিয়ে। তারা বলতে থাকবে- তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, কারণ তোমরা ধৈর্য্যধারণ করেছ। কতইনা উত্তম তোমাদের পরিণামফল। পক্ষান্তরে যারা সেই প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে আল্লাহর আদেশকৃত বিষয়াবলী অমান্য করে এবং যমিনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, তাদের জন্য রয়েছে অভিশাপ আর কুপরিণামফল।"
আর এভাবেই উভয় দলের বিভক্তির বিবরণ সমাপ্ত হয়।

নবী রাসূল এবং তাদের উত্তরসূরীদের মিশন

আল্লাহ তা'লা বলেন- "আর তিনি তোমাদের জন্য ঐ দ্বীনকে নির্ধারণ করেছেন, যা পালনের জন্য তিনি নূহকে আদেশ করেছিলেন। আপনার কাছে যার বিবরণ পাঠিয়েছি সেটি হচ্ছে ঐ দ্বীন, যার ব্যাপারে তিনি আদেশ করেছিলেন ইবরাহীম, মূছা ও ঈসাকে, (যার মর্ম হচ্ছে) দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর! এতে ভেদাভেদ সৃষ্টি করোনা! আপনার দাওয়াতের মিশনটি মুশরেকদের জন্য বড়ই জ্বালাময়ী।" উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'লা নবীদেরকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার আদেশ দিচ্ছেন। আর দ্বীন প্রতিষ্ঠার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানাবলীকে প্রথমে নিজের জীবনে অতপর মানুষের মাঝেও তা প্রতিষ্ঠিত করা। এ কারণেই নবীদেরকে তিনি দাওয়াত, বিবরণ ও ভীতি প্রদর্শনের আদেশ করেছেন। আল্লাহ তা'লা বলেন- "প্রেরণ করেছি এমনসব রাসূল, যারা সুসংবদদাতা এবং ভীতিপ্রদর্শনকারী।" সুতরাং নবীদের একমাত্র মিশন ছিল সমস্ত মানুষকে হেদায়েতের দিকে নিয়ে আসা, আল্লাহর মনোনীত বিষয়াবলীকে আকড়ে ধরা, নিষেধকৃত বিষয়বালী থেকে দূরে থাকা। আল্লাহ তা'লা বলেন- "আপনি হচ্ছেন একজন সতর্ককারী, আর প্রত্যেক জাতির জন্যই হেদায়েতকারী গত হয়েছে।"

অপর স্থানে এরশাদ করেছেন- "নিশ্চয় আপনি সঠিক পথের দিকে আহবান করেন।" এখানে সঠিক পথের দিকে আহবান বলতে আল্লাহর দিকে দাওয়াত, সরল পথের দিশা উদ্দেশ্য। নবী রাসূলদের সাথে আল্লাহ পাক বহু কিতাবাদী নাযিল করেছেন, তাদেরকে প্রজ্ঞা শিখিয়েছেন। আল্লাহ তা'লা বলেন- "স্মরণ করুন ঐ সময়ের কথা, যখন আল্লাহ নবীদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, অবশ্যই আমি তোমাদের কাছে কিতাব ও প্রজ্ঞা অবতীর্ণ করব।"

এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'লা নবী-রাসূলদের অন্তরে সমগ্র সৃষ্টির প্রতি রহমত ও তাদের হেদায়েতের জন্য প্রচন্ড আগ্রহ গেঁথে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'লা বলেন- "যদি তারা এই বিষয়বস্তুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে তাদের পশ্চাতে সম্ভবত আপনি পরিতাপ করতে করতে নিজের প্রাণ নিপাত করবেন।" পাশাপাশি আল্লাহ পাক তাঁর শেষ নবী মুহাম্মাদ সা.কে "অতিশয় দয়াবান ও পরম অনুগ্রহকারী" গুণে ভূষিত করেছেন। এরশাদ করেছেন- "আর তিনি হচ্ছেন এমন এক নবী, যিনি ঈমানদারদের প্রতি অতিশয় দয়াবান ও পরম অনুগ্রহকারী।"

নবীদের এ সুদীর্ঘ ধারাবাহিকতায় সর্বশেষজন হিসেবে আল্লাহ পাক প্রেরণ করেন মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এরশাদ করেছেন- "নবী মুহাম্মদ তোমাদের থেকে কোন পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী।" রাসূলে কারীম সা. বলেন- "আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের উদাহরণ হল ঐ প্রাসাদের ন্যায়, যা একজন মানুষ সুন্দর ও সুপ্রতিষ্ঠিত করে গড়ে তুলল, কিন্তু একটি মাত্র ইটের স্থান সেখানে খালী রেখে দিল। অতপর লোকজন যখন সুদর্শন এ প্রাসাদটিতে প্রবেশ করল, তখন আশ্চর্যের সূরে বলতে লাগল- 'হায়! একটি মাত্র ইটের স্থান কেন বাকী রাখা হল ?!!' (বুখারী-মুসলিম)। মুসলিম শরীফের বর্ণনায় আরো যোগ হয়েছে- 'আর আমিই হচ্ছি সেই সর্বশেষ ইট, আমার আগমণের দ্বারা নবী ধারাবাহিকতার সমাপ্তি ঘটেছে।'

ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন, যেখানে নবী করীম সা. এরশাদ করেছেন- "আমরাই হচ্ছি সর্বশেষ উম্মত, আর আমরাই বিচারদিবসে সর্বাগ্রে থাকব। তবে প্রত্যেক উম্মতকেই কিতাব দেয়া হয়েছে আমাদের পূর্বে, আর আমাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের সকলের পরে।"

নবী মুহাম্মাদ সা.কে আল্লাহ তা'লা সমগ্র পৃথিবীবাসীর হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছেন। এতে আল্লাহ তা'লা কোন বর্ণের ভেদাভেদ রাখেননি; সাদা-কালো-লাল বা আরব-অনারবের মধ্যে উনাকে নির্ধারিত রাখেননি। ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে সকল প্রকার লোকের হেদায়েতের জন্য তিনি প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহ তা'লা বলেন- "আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি।" নবী করীম সা. বলেন- "ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ নিহীত- এই উম্মতের যে কোন ইহুদী বা যে কোন খৃষ্টান আমার কথা শুনার পরও যদি ঈমান না নিয়ে মৃত্যুবরণ করে,

তবে অবশ্যই সে জাহান্নামের অধিবাসী হবে।" নবী করীম সা. আরও বলেন- "পূর্ববর্তী রাসূলদেরকে কোন নির্ধারিত জাতির হেদায়েতের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হত, আর আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে সমগ্র জাতির হেদায়েতের জন্য।"

বিজয়ী দল এবং দ্বীনের বহিঃপ্রকাশ

আল্লাহ তা'লা স্বীয় মনোনীত দ্বীনের প্রকাশ এবং যুক্তি-প্রমাণের সুস্পষ্ঠ ভিত্তি আর বর্শা-তলোয়ারের বলিষ্ঠ শক্তির সাহায্যে সত্যের কালেমা সমুন্নত করার বিষয়টি বহুপূর্বেই লিখে রেখেছিলেন। আল্লাহ তা'লা বলেন- "সেই প্রভূ যিনি স্বীয় রাসূলকে হেদায়েত আর সত্যের ধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যেন এই সত্য ধর্মকে তিনি সমস্ত ভ্রান্ত ধর্মের উপর সমুন্নত করেন। যদিও অবিশ্বাসীরা একে অপছন্দ করে থাকে।" আর নবী করীম সা. এর আগমণ হয়েছে মানুষের পরীক্ষার জন্য। এরশাদ করেছেন- "নিশ্চয় আমি আপনাকে পরীক্ষা করব, পাশাপাশি আপনার মাধ্যমে অন্যদেরও পরীক্ষা করব।"

দ্বীন প্রতিষ্ঠার এ বিশাল মিশন বাস্তবায়ন এবং উভয় জগতে শান্তি উন্নতি অর্জনের লক্ষে আল্লাহ তা'লা উক্ত নবীর সাথে প্রেরণ করেছেন প্রামাণ্য গ্রন্থ এবং লৌহতুল্য মাপকাঠি। আল্লাহ তা'লা বলেন- "নিশ্চয় আমি সুস্পষ্ঠ প্রমাণসহ বহু রাসূল প্রেরণ করেছি। পাশাপাশি তাদের সাথে অবতরণ করেছি কিতাব এবং মাপকাঠি, যেন মানুষেরা পূর্ণ ন্যায়নিষ্ঠতা সহকারে সকলকিছু সম্পাদন করতে পারে। আর আমি অবতরণ করেছি লৌহ, যাতে রয়েছে প্রচন্ড শক্তি আর মানুষের জন্য বহু উপকারী বিষয়। এগুলো এজন্য যে, আল্লাহ যেন জেনে নিতে পারেন- কারা আল্লাহকে না দেখেই তাঁর রাসূলদেরকে সহযোগীতা করে থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী সর্বশক্তিমান।"

সুতরাং আল্লাহর কিতাব সত্যের দিকে পথপ্রদর্শন করে এবং লৌহ পথভ্রষ্টকে সোজা করে দেয়। আর মানুষকে সঠিক পথে আনার জন্য লৌহের বিকল্প নেই। যখনই কিতাব ও লৌহের কোন একটি দুর্বল হয়ে পড়বে, তখনই ভূপৃষ্ঠে বিশৃঙ্খলা আর পাপাচার দেখা দিবে। নবী করীম সা. এরশাদ করেছেন- "কেয়ামতের এ পূর্বক্ষণে আমাকে তরবারী দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, যতক্ষণ না সকল মানুষ এক আল্লাহর এবাদতে ফিরে আসে।"

এটিই হচ্ছে নবীজীর একমাত্র ত্যাজ্যসম্পদ, যা উম্মতের জন্য তিনি রেখে গেছেন। এক- পথপ্রদর্শনকারী সুস্পষ্ঠ কিতাব। দুই- সঠিক পথের সংস্কারক বলিষ্ঠ তরবারী। এ বিবেচনায় মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এক- উম্মতের জ্ঞানীগুণী বা আলোম সম্প্রদ্রায়। দুই- আল্লাহর পথে জিহাদরত মুজাহিদ সম্প্রদায়। নবীগণের পর একমাত্র সাহাবায়ে কেরামকেই আল্লাহ তা'লা উভয় গুণে গুনান্বিত করেছিলেন। আল্লাহ তা'লা এরশাদ করেছেন- "মুহাম্মাদ হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল, তাঁর সাথে আছেন এমন এক সম্প্রদায়, যারা কাফেরদের বিরোদ্ধে কঠোর এবং নিজেদের পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান। আপনি তাদেরকে একমাত্র আল্লাহর দয়া ও সন্তুষ্টির আশায় রুকু সেজদাকারী পাবেন। সেজদার চিহ্নস্বরূপ তাদের চেহারায় এক বিশেষ নিদর্শন থাকবে। এটিই হচ্ছে তাওরাতে বর্ণিত তাদের নিদর্শন। আর ইঞ্জিলে তাদের অবস্থা যেমন একটি চারাগাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশালয়, অতপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কান্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে, চাষীকে আনন্দে আভিভূত করে, যাতে আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন।" নবী করীম সা. এরশাদ করেন- "নিশ্চয় আলেম সম্প্রদায় হচ্ছে নবীদের উত্তরাধীকারী। আর নবীগণ কোন টাকা-পয়সা রেখে যাননা; বরং নবীগণ জ্ঞান বা এলেম রেখে যান। সুতরাং যে ব্যক্তি নবীদের এ ত্যাজ্যসম্পদ গ্রহণ করল, অবশ্যই মহা সৌভাগ্যের কারণেই সে তা গ্রহণ করল।"

যেমনভাবে আল্লাহ পাক তাঁর শেষনবীকে পূর্ববর্তী নবীদের অনুসরণের আদেশ দিয়েছেন। এরশাদ করেছেন- "তারা হচ্ছেন ঐ সকল নবী, যাদেরকে একমাত্র আল্লাহ পাক পথপ্রদর্শন করেছেন, সুতরাং আপনি তাদের পথই অনুসরণ করুন।" ঠিকতেমনিভাবে মুহাম্মদ সা.এর উম্মতকেও তাদের প্রিয়নবীর পরিপূর্ণ অনুকরণের আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ পাকের এ মহা আদেশের কারণেই মুমিনগণ শেষনবীর ত্যাজ্যসম্পদ এলেম গ্রহণে মনোনিবেশ করেন। নিজেদের মধ্যে এবং জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনে এর বাস্তবায়ন ঘটাতে প্রয়াস পান। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের নাযিলকৃত পবিত্র জ্ঞান অধ্যয়ন করল, তার জন্য আবশ্যক হল- অন্যকেও এ সম্পর্কে জ্ঞাত করা। নবী করীম সা. এরশাদ করেন- "ঐ ব্যক্তির চেহারাকে আল্লাহ পাক সৌন্দর্যমন্ডিত করুন, যে আমার কথা শুনে তা সংরক্ষণ করল এবং যেমন শুনেছিল ঠিক তেমনি অন্যের কাছে বর্ণনা করল। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এথেকে বিমুখতা অবলম্বন করল, তার সাথে তারা লড়াই করল, যতক্ষণ না সে আল্লাহর নাযিলকৃত সত্য বিধানের প্রতি মাথা নত করে। আল্লাহ তা'লা বলেন- "তোমরা যুদ্ধ কর আহলে কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখেনা, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলে যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করেনা এবং গ্রহণ করেনা সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে।" ঠিক এমনই ছিলা নবী করীম সা.এর অনুসারীদের যুগ। এমনই ছিল তাদের জ্ঞান সম্প্রসারণ- সমগ্র বিশ্ববাসীকে সত্যের দিকে পথপ্রদর্শন এবং দাম্ভিক ও বিমুখতা অবলম্বনকারীদের শায়েস্তাকরণ। তাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল এ দু'টি বিষয়ের উপর সন্নিবেশিত। ফলে নবী করীম সা.এর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরাম ছড়িয়ে পড়িয়েছিলেন পৃথিবীর বিভিন্নপ্রান্তে। উছামার বাহিনী রূমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বের হয়েছিল। সিংহভাগ সাহাবায়ে কেরাম ইসলাম থেকে বহির্ভূত আরবদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য বের হয়েছিল। সাহাবায়ে কেরামের পর এই সত্যধর্মকে বহন করল তাবেয়ীন। এরপর পরবর্তী প্রজন্ম, পরবর্তী প্রজন্ম.....।

নবী করীম সা. বলেন- "পরবর্তী প্রজন্মসমূহে প্রত্যেক ন্যায়বান ব্যক্তি এ মহা জ্ঞানের বাহক হবে। তারা মিথ্যুকদের বিকৃত সংযোজন, পাপিষ্ঠদের চুরি এবং মুর্খদের অপব্যাখ্যা থেকে এ জ্ঞানকে রক্ষা করবে।" জ্ঞানীদের কলমের কালি এবং শহীদদের তরতাজা খুন হচ্ছে আল্লাহ পাকের নৈকট্যতা অর্জনের সুপ্রিয় বিষয়। জ্ঞানীদের কলম ব্যবহৃত হয় বিশ্ববাসীকে পথপ্রদর্শন, তাদেরকে সত্যের বিধানাবলী শিক্ষাদান, কুসংস্কারের মূলোৎপাটন এবং সত্যকে ছড়িয়ে দেবার কাজে। আর শহীদদের রক্ত প্রবাহিত হয় সর্বপ্রকার বাধা বিপত্তি উৎখাত করে বিশ্বময় আল কোরআনের আলো ছড়িয়ে দেবার কাজে। যখনই কোথাও কুসংস্কার দেখা দিয়েছে, সাথে সাথে উম্মতের জ্ঞানী সম্প্রদায় এর বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করে সর্বপ্রকার বক্রতাকে সোজা করে দিয়েছে, মানুষকে এথেকে দূরে রেখেছে। যখনই মানুষ কোন একটি বিধানকে ভুলে বসতে শুরু করেছে, তখনই জ্ঞানী সম্প্রদায় তা সমুন্নত করে উম্মতকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। যখনই উম্মতের মধ্যে কোন আভ্যন্তরীণ শত্রুবা অনিষ্টকারী মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে অথবা বহির্বিশ্ব থেকে কোন শত্রুদল এসে মুসলমানদের রক্ত নিয়ে ছিনিমিনি খেলার সাহস করেছে, তখনই জ্ঞানী সম্প্রদায় নাঙ্গা তরবারী হাতে তাদের বিরুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছে, শত্রুদের বিষদাঁত ভেঙ্গে দিয়ে সমূলে তাদেরকে পরাজিত করেছে।

ঠিক যেমনটি মুরতাদদের বিরুদ্ধে করেছিলেন ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর রা.। খারেজী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে করেছিলেন ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত আলী বিন আবি তালিব রা.। খারেজীদের বিরুদ্ধে তিনি সর্বপ্রথম আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা.কে প্রেরণ করেছিলেন। সেখানে

গিয়ে তিনি তাদের সাথে বাকযুদ্ধ করেছিলেন। তাদেরকে অনেক বুঝানোর পরও তারা সৎ পথে ফিরে আসতে আপত্তি করলে আলী রা. তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষনা করেন। ফলে তাদের একটি বিরাট অংশকে তখনই নিশ্চিহ্ন করে দেয়া সম্ভব হয়েছিল। প্রখ্যাত আমীরুল মুমেনীন উমর বিন আব্দুল আযীযও তাদের বিরুদ্ধে একই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ তা'লা বহুপূর্বেই কেয়ামত পর্যন্ত সত্যের একটি বিজয়ী দল বেঁচে থাকার কথা লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন, যারা সত্যের ধারক বাহক হয়ে বর্শা আর তরবারী হাতে নিয়ে কেয়ামতের আগ পর্যন্ত লড়াই করে যাবে। নবী করীম সা. এরশাদ করেন- "কেয়ামতের আগ পর্যন্ত আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল সর্বদায় যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে, কোন বিরুদ্ধবাদীদের বিরোধিতা তাদের থামাতে পারবেনা। শেষপর্যন্ত ঈসা বিন মারয়াম আ. আসমান থেকে অবতরণ করবেন। তখন তাদের ইমাম বলবে- আসুন! নামাযের ইমামতি করুন! উত্তরে ঈসা আ. বলবেন- না! বরং তোমরা হচ্ছ মর্যাদাশীল উম্মত। তোমাদের মধ্যেই আল্লাহ পাক আমীর নির্ধারণ করেছেন। অপর একটি হাদিসে নবী করীম সা. বলেন- "আমার উম্মতের একটি দল সর্বদায় আল্লাহর আদেশমতে লড়াইয়ে লিপ্ত থাকবে, তারা শত্রুদের উপর সর্বদায় বিজয়ী থাকবে। বিরোধীদের বিরুদ্ধাচারণ তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা। কেয়ামত পর্যন্ত তারা এভাবেই বিজয়ী বেশে যুদ্ধ করতে থাকবে।" আর এ লড়াইকারী দল সর্বাবস্থায় অপরিচিত ও অল্পসংখ্যক থাকবে।

ইমাম তিরমিযী রহ. স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সা. এরশাদ করেছেন- "নিশ্চয় এ দ্বীনের সূচনা হয়েছে অপরিচিত অবস্থার মধ্য দিয়ে। আর অচিরেই এই দ্বীন অপরিচিত অবস্থাতেই ফিরে আসবে। সুসংবাদ ঐ সকল অপরিচিতজনদের জন্য, যারা সবসময় আমার আনীত বিধানাবলীমতে মানুষকে সংশোধনের চেষ্টায় লিপ্ত থাকে।" অপরিচিতদের পরিচিতি বর্ণনা করতে গিয়ে অপর এক হাদিসে বলেছেন- "যারা স্বীয় দ্বীন নিয়ে সুদূর পলায়ন করে, শেষপর্যন্ত তারা ঈসা বিন মারয়াম আ.এর কাছে গিয়ে মিলিত হবে।" অপর বর্ণনায়- "তারা হচ্ছে অত্যাধিক পাপিষ্ঠ লোকদের মধ্যে যৎসামান্য ন্যায়বান কিছু লোক, তাদের বিরোধীদের সংখ্যা অনুসারীদের সংখ্যার তুলনায় বেশি হবে।"

নবী করীম সা.এর উত্তরাধিকারী দুই প্রকার

প্রথম প্রকার- সত্য ও হেদায়েতের দিকে আহবানকারী জ্ঞানী সম্প্রদায়, যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানাবলীর মধ্যে কোনকিছুই গোপন রাখেনা। আল্লাহ তা'লা বলেন- "স্মরণ করুন! যখন আল্লাহ পাক কিতাবপ্রাপ্ত লোকদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, তোমরা আল্লাহর বিধানাবলীকে মানুষের সামনে সুস্পষ্ঠরূপে বর্ণনা করবে, কোনকিছু লুকাবেনা।" যে ব্যক্তি এলেম শিখল, তার উপর আবশ্যক হচ্ছে মানুষের মাঝে তা ছড়িয়ে দেয়া, অন্যথায় বিচারদিবসে তাকে আগুনের মালা গলায় পরতে হবে। যেমনটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকার- ঐ সকল ব্যক্তিবর্গ, যারা এই মহাজ্ঞানকে রক্ষা করবে এবং মানুষের মাঝে তা প্রতিষ্ঠিত করবে। তারা হচ্ছে আল্লাহর পথের মুজাহিদীন। আর সবচে' উত্তম হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে উভয় গুণের মাধ্যমে নিজেকে ধন্য করল। এটাই হচ্ছে হাদিসে উল্লেখিত বিজয়ী দলের গুণাবলী। এটাই হচ্ছে এলেম এবং জিহাদের দল।

রাসূলে কারীম সা. এরশাদ করেন- "আমার পূর্বে যত নবী পাঠানো হয়েছে, সকল নবীদেরই সাথী-সহযোগী ছিল, যারা নবীর আনীত বিধানকে আঁকড়ে ধরত, নবীর আদেশগুলো মেনে চলত। অতপর নবীদের ইন্তেকালের পর এমন প্রজন্ম আসত, যারা মুখে বলত একরকম আর কাজ করত অন্যরকম। তাদের কথা আর কাজে গরমিল ছিল। (স্মরণ রেখো) যে ব্যক্তি শক্তির মাধ্যমে জিহাদ করল, সে মুমিন। যে ব্যক্তি মুখের কথার মাধ্যমে জিহাদ করল, সেও মুমিন। যে ব্যক্তি অন্তরের মাধ্যমে জিহাদ করল, সেও মুমিন।"

উলামায়ে কেরামের ভূমিকা সর্বাবস্থায় উম্মতের জন্য দলীলস্বরূপ। যেমনভাবে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. "কুরআন সৃষ্ট" শ্লোগানে আভিভূত ফেতনার মুকাবেলায় ভূমিকা পালন করেছিলেন। ফেতনাটি এতই ভয়াবহ ছিল- মনে হচ্ছিল এই একটি ফেতনাই উম্মতকে শিরক ও কুফুরীর দিকে নিয়ে যাবে। কিন্তু এর মুকাবেলায় ইমাম আহমদ রহ. সিংহের ভূমিকা রেখেছিলেন। ফলে আল্লাহ পাকও তাকে সহযোগীতা করেছিলেন। যেমনভাবে "বাতেনী আবেদী" সম্প্রদায়ের ছুহনূনের অনুসারীদের বিরুদ্ধে মালেকী উলামায়ে কেরাম ভূমিকা রেখেছিলেন। তাদেরকে স্বমূলে হত্যা করে তাদের ভেতরে লুকিয়ে থাকা নাস্তিকতার মুখোশকে উন্মোচন করেছিলেন।

রু'আইনী স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করেন- "কায়রুয়ান প্রদেশের উলামায়ে কেরাম যেমন- আবূ মুহাম্মাদ বিন আবি যাইদ, আবুল হাসান কাবেছী, আবুল কাসেম বিন শিবলূন, আবূ আলী বিন খালদূন, আবূ মুহাম্মাদ তাবিকী, আবূ বাকার বিন আযরা। তারা সকলেই একমত হয়েছিলেন যে, "বনী আবীদ" সম্প্রদায়ের পরিস্থিতি মুরতাদ-যিন্দীকদের পরিস্থিতির অনুরূপ। সুতরাং মুরতাদদের পরিস্থিতি শরীয়তের সম্পূর্ণ বিপরীত হওয়ায় সর্বসম্মতিক্রমে তারা কোন মীরাছ পাবেনা। আর যিন্দীকদের পরিস্থিতি হলে সর্বসম্মতিক্রমে তাদেরকে হত্যা করা হবে।" ফলে উলামায়ে কেরাম সকলেই তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন।

ইবনুল জাওযী রহ. বলেন- "জওহর সাকালী (মিশরের আবিদী সম্প্রদায়ের নেতা) আবূ তামীমের জন্য (মিশরের নেতা) আবূ বাকার নাবলূসী নামক একজন সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন- আমরা জানতে পেরেছি যে, আপনি নাকি বলেছেন যে, কোন ব্যক্তির সাথে যদি দশটি তীর থাকে তবে এর নয়টি তীরই নিক্ষেপ করতে হবে আমাদের দিকে, আর একটি নিক্ষেপ করতে হবে রূমকদের দিকে। তখন তিনি উত্তরে বলেছিলেন- আমি একথা বলিনি; বরং আমি বলেছি- যদি কারো কাছে দশটি তীর থাকে, তবে এর দশটিই তোমাদের দিকে নিক্ষেপ করতে হবে। কারণ, তোমরা জাতির বিশ্বাসে কলংক মেখে দিয়েছ, ন্যায়বান লোকদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে প্রভূর নৈকট্যতা অর্জনের ঘোষণা দিয়েছ। একথা শুনার পর আবিদী সম্প্রদায় তাকে এলাকায় প্রচার করল। অতপর জঘন্যভাবে তাকে মেরে এক ইহুদীকে দিয়ে উনার শরীর থেকে চামড়া ছিড়ে ফেলা হল।"

ইমাম যাহাবী রহ. বলেন- "মরক্কোর উলামায়ে কেরাম একমত হয়েছেন যে, আবিদী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরয। কারণ, তারা প্রকাশ্যে কুফুরীর ঘোষণা দিয়েছে যেখানে কোন কৌশল থাকতে পারেনা। ইমাম আহমদ বিন আবি ওয়ালীদ একদা ভাষণ দানকালে বলেন- ওহে লোকসকল! যুদ্ধ কর প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে, যে আল্লাহর সাথে কুফুরী করে, মনে করে নিজেও একজন প্রভূ, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানাবলীকে পরিবর্তন করে, আল্লাহর প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সা. ও তার সাহাবাকে গালমন্দ করে। একথা শুনে উপস্থিত লোকেরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। অতপর রাবীয়ুল কাত্তান নামক এক ব্যক্তি সশস্ত্রাবস্থায় একটি ঘোড়ার চড়ে আসে। আহমদ বিন ওয়লীদ রহ. তখন জিহাদের আয়াতগুলো পাঠ করছিলেন, উনার ঘাড়ে একটি কোরআন ছিল। আশপাশে অনেক লোক জড়ো ছিল। অতপর তিনি এবং আশপাশের অনেক লোক শাহাদাৎ বরণ করেন।

যেমনভাবে ইমাম আহমদ বিন তাইমিয়া রহ. সত্য, হেদায়েত ও সঠিক বিধানাবলী বর্ণনার মাধ্যমে কুসংস্কার প্রবক্তা, নাস্তিকতার দর্শন ও ভন্ড সূফীবাদ নির্মূলে বিরাট ভূমিকা পালন করেছিলেন। এভাবেই তিনি প্রবৃত্তিত্তর ডাষ্টবিনে আচ্ছন্ন সত্যকে সঠিক ও উজ্জল বর্ণনার মাধ্যমে শক্তিশালী

করেছিলেন। অতপর তিনি মুজাহিদীনের কাতারে দাড়িয়ে তাতারীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই করেছিলেন। সর্বসাধারণকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। মুসলিম শাসকদের প্রতি এই বলে বার্তা পাঠিয়েছিলেন যে, তাতারীদের বিরুদ্ধে অবশ্য পালনীয় যুদ্ধে যদি তারা বিন্দুমাত্র অলসতার পরিচয় দেয়, তবে তাতারীরা মুসলিম শাসকদেরকে পরাজিত করে তাদের স্থলে তাতারীদেরকে শাসক হিসেবে নিযুক্ত করবে। কঠিন এই পরিস্থিতিতে যখন জিহাদের বিষয়টি ঘোলাটে হয়ে পড়েছিল, মানুষেরা বুঝতে পারছিলনা যে, তাতারীদের বিরুদ্ধে লড়াইটি কোন প্রকারের জিহাদ। তখনই তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, ইসলামী শরীয়ত বাস্তবায়নে বাধা প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে যেমন জিহাদ করা ফরয, তাতারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাও তদ্রুপ ফরয। এই ঘোষণার মাধ্যমে সত্য উন্মোচিত হয়েছিল, মানুষের অন্তর থেকে সর্বপ্রকার সন্দেহ-সংশয় দূর হয়েছিল। সবাই মিলে তাতারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিল। ফলে আল্লাহ তা'লাও তাতারীদের নির্মূল করে মুসলমানদের গলায় বিজয়ের মালা পরিয়েছিলেন।

এভাবেই চলতে থাকে দাওয়াত আর জিহাদের ধারাবাহিকতা। যুগ যুগ পেরিয়ে আজো আমরা এতদুভয়ের সংমিশ্রণ লক্ষ করছি। কেয়ামত পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

ওহে আমার মুসলমান ভাই...!!

আপনি যখন উপরোক্ত বিষয়গুলো জানতে পারলেন এবং আপনার সামনে এগুলো স্পষ্ঠ ও সঠিকরূপে প্রকাশ হল, তখন সর্বপ্রথম আপনার নিজের উপর এ মহা দায়িত্বটি অর্পিত হয়ে গেছে। এখন অবশ্যই আপনি ঐ দলটিকে খুজতে থাকবেন, যার ইতিহাস আজ থেকে নিয়ে নবী করীম সা.এর কাল পর্যন্ত বিস্তৃত, যে দলটি মানুষকে তাওহীদ ও সুন্নতের দিকে আহবান করে, মানুষের সামনে শিরক-বিদআতের মুখোশ উন্মোচন করে এবং আল্লাহর রাস্তায় কেয়ামত পর্যন্ত জিহাদের দৃঢ় বাসনা পোষন করে।

এখন আপনি নিজেকেই প্রশ্ন করুন- আমরা কারা ? আর জিহাদই বা কেন করতে হবে ? বস্তুত আমরা এমন এক পরিবেশে বড় হয়েছি যেখানে এলেমকে পেয়েছি আমরা অস্তিত্বহীন, উম্মতকে পেয়েছি মুর্খতার চাদরে ঢাকা এক সম্প্রদায়। চারিদিকে পাপাচার ছেয়ে আছে। মানুষের হক নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। মুসলমানদের ভূমিগুলো বিধর্মীদের দখলে চলে গেছে। মুনাফিক আর মুরতাদ শাসক হয়ে বসে আছে। তাহলে এহেন পরিস্থিতিতে দ্বীনের জ্ঞানবাহকদের উপর কিরূপ দায়িত্ব অর্পিত হতে পারে..??!!

জ্ঞানবান লোকদের উপর আল্লাহ তা'লা বর্তমান সময়ে এক বিরাট দায়িত্ব অর্পন করেছেন। আর সেটি হচ্ছে সালফে সালেহীনের কিতাবগুলো মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া। আমাদের পূর্বে এক লম্বা সময় গত হয়েছে, যেখানে সর্বসাধারণের কাছে জ্ঞান পৌছার মহাসুযোগ ছিলনা। মুষ্টিমেয় কিছু কিতাবের উপর মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমান সময় আল্লাহর রহমতে মানুষের কাছে এক বিরাট সুযোগ আপতিত হয়েছে। যেখানে সালফে সালেহীনের কিতাবগুলোকে নতুন ধাঁচে ছাপানো হচ্ছে। অতপর মানুষেরা এগুলো সংগ্রহ করে নতুন ধাঁচে ইসলামকে চিনতে শুরু করেছে। ফলে আবূ বকর থেকে নিয়ে অদ্যাবধি কোরআন-সুন্নাহর সাথে সম্পৃক্ত সত্যনিষ্ঠ সকল ইমামগণের ন্যায় বাস্তব ও সঠিক পরিস্থিতিকে তারা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে শুরু করেছে।

কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতির প্রতারণায় পড়ে উম্মত আজ পরিবর্তন হয়ে গেছে। দ্বীনের প্রতিটি শাখায় মুর্খতার কালো ছায়া গ্রাস করে ফেলেছে। এর মুর্খতার কবলে পড়েই জাতি ফেতনা ফ্যাসাদ আর ধ্বংসাত্মক অপরাধমূলক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়েছে। বরং কতিপয় মুসলমান তো মুশরেকদের দলে ভীড়ে তাদের ধর্ম অনুসরণে ব্রতী হয়েছে। এরপর উপরে তাকিয়ে দেখেছে যে, তাদের উপর শাসকের বেসে বসে আছে এমন কিছু লোক, যারা নিজেদের মহামূল্যবাণ ধর্মকে শয়তানের সন্তুষ্টিতে বিক্রি করে দিয়ে বিধর্মীদের কালচারে প্রবেশ করেছে। সর্বপ্রকার মঙ্গলজনক বিষয়ের পথকে তারা রুদ্ধ করে দিয়েছে। মসজিদে মসজিদে তালা ঝুলিয়েছে। উলামাদের মজলিসে আগমণ নিষেধ করা হয়েছে। দ্বীনের ধারক বাহক জ্ঞানী দাঈদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে দেয়া হয়েছে। সব ধরনের অনিষ্ট কর্মকান্ডে জড়িয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার বাহক হয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের মত বাতিল ও কুফুরী মতবাদসমূহকে মানুষের কাছে উত্তম ধাঁচে তুলে ধরেছে। জনসাধারণকে পাপাচারে লিপ্ত হতে বাধ্য করা হয়েছে। সুদের সর্বপ্রকার খাতকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। সুদী পন্থা অবলম্বন ছাড়া মানুষের দৈনন্দিন জীবন অচল করে দেয়া হয়েছে। দারিদ্রের সাথে লাঞ্ছনাকে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে যুবকদের জন্য অপরাধে জড়ানো ব্যতিত আর কোন উপায় থাকেনি। অনিষ্টতা ও অশ্লিলতার সকল উপকরণকে জনসাধারণের জন্য খুব সহজ করে দেয়া হয়েছে। জাতি প্রত্যক্ষ করেছে যে, তাদের আশপাশের নামগুলো পূর্বের ঐ ইসলামী নামেই বাকী আছে। কিন্তু বাস্তবে সম্পূর্ণই তা ইসলামবিরোধী। সাথে সাথে এমনকিছু ভন্ড ব্যক্তিদের আবির্ভাব ঘটেছে, যারা তাদের কর্মকান্ডসমূহকে পূর্ণাঙ্গতায় রূপ দিয়েছে, সবকিছুকে তাদের জন্য শরীয়তসম্মত বলে আইন জারি করেছে। সুতরাং নাস্তিকতাই আজ তাদের কাছে প্রকৃত স্বাধীনতা। তাগুতের ধর্মে অনুপ্রবেশই প্রকৃত গণতন্ত্র। কাফের-বেঈমানদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন হচ্ছে শান্তির প্রতীক ও জাতীয় একাত্মবোধ। আর আল্লাহর নাযিলকৃত শরীয়ত ও দ্বীন হচ্ছে সেই পুরাতন মধ্যযুগীয় ব্যাপার। মহিলার ভ্যাবিচারে লিপ্ত হওয়াকে ব্যক্তি স্বাধীনতা বলে নাম দেয়া হয়েছে। দেশ ও সার্বভৌমত্ব বিক্রি করে দেয়াকে প্রকৃত শান্তি বলে প্রচার করা হয়েছে।

এটাই হচ্ছে সেই বাস্তবতা, যা সরল প্রভূভক্ত একজন যুবক চারিদিকে প্রত্যক্ষ করছে। ফলে দ্বীনের যতটুকু জানার, সে জানতে পারছে। অতপর সত্যের কালেমাকে বুকে নিয়ে শত্রুদের দিকে ছুড়ে দিয়েছে। আল্লাহর দিকে মানুষকে আহবান করে জনসাধারণের সামনে প্রকৃত বাস্তবতা উন্মোচনে সচেষ্টবান হচ্ছে। সবকিছুর সমষ্টি পেয়েছে দু'টি বিষয়ের সাথে- এক- দাওয়াত ইলাল্লাহ তথা আল্লাহর দিকে আহবান। দুই- জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ তথা আল্লাহর পথে জিহাদ।

দাওয়াত ইলাল্লাহ- এ মিশনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে দ্বীনী বিষয় শিক্ষাদান। সুন্নত ও তাওহীদের ব্যাপারে জনসাধারণকে সজাগকরণ। এর প্রধান কর্মপদ্ধতি হচ্ছে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ।

জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ- মুরতাদদের বিরুদ্ধে একচেটিয়া মিশন। কারণ মূলধন হচ্ছে লাভের উপরে। তাদের মুরতাদ হওয়ার প্রমাণ হচ্ছে যে, তারা আল্লাহর শরীয়তকে বিকৃত করে ইহুদী খৃষ্টান ও সমাজতন্ত্রবাদীদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে। পক্ষান্তরে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী মুমিন মুসলমানদের সাথে শত্রুতা পোষন করেছে। আর পূর্ববর্তী-পরবর্তী সকল উলামায়ে ইসলামের ঐক্যমতে উপরোক্ত কর্মকান্ডে জড়িত ব্যক্তির পরিচয় হচ্ছে- সে কাফের মুরতাদ। নিম্নে আল্লাহর দ্বীন বিকৃতকারী এবং শয়তানের শরীয়ত মান্যকারীর বিধান দেয়া হল- "শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন- কোন মানুষ যখন সুস্পষ্ট হারাম বিষয়কে হালাল মনে করে অথবা সুস্পষ্ট হালালকে হারাম মনে করে অথবা সুস্পষ্ট শরীয়তকে পরিবর্তন করে ফেলে, তবে সকল ফুকাহায়ে কেরামের ঐক্যমতে সে কাফের হয়ে গেছে।"

এবাদত প্রতিষ্ঠিত হবে অনুসরণ ও আদেশ মান্য করার ভিত্তিতে। আর একমাত্র এবাদতকৃত প্রভূর আদেশ মান্য করা ছাড়া এবাদত কোন সময় গ্রহণযোগ্য হবেনা। সুতরাং যে কোন ব্যক্তি যদি নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ আদেশকারী বা নিষেধকারী মনে করে এবং নিজের পক্ষ থেকে কোন বস্তুর উপর হালাল বা হারামের বিধান প্রয়োগ করে, তবে প্রকৃতঅর্থে সে নিজেকে মা'বূদ বা অনুসৃত হিসেবে ঘোষণা করল। আল্লাহ তা'লা বলেন- "আর আমি প্রত্যেক জাতির কাছেই এই বলে রাসূল প্রেরণ করেছি যে, একমাত্র আল্লাহর এবাদত কর আর সর্বপ্রকার তাগুত থেকে দূরে থাক।" আর আল্লাহর এবাদতের মূল ভিত্তি হচ্ছে অনুসরণ ও আদেশ মান্য করার দিক থেকে একমাত্র আল্লাহকে নির্দিষ্ট করে নেয়া। সুতরাং আদেশ একমাত্র আল্লাহর, বিধান একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ বলেন- "সমস্ত আদেশ একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত।" অন্যত্র বলেন- "নিশ্চয় আদেশ একমাত্র আল্লাহর জন্য।" এরশাদ করেছেন- "তার জন্যই সকল সৃষ্টি, তার জন্যই সকল আদেশ।" এরশাদ করেছেন- "তোমরা যখন কোন বিষয়ে মতভেদ পোষন কর, তখন আল্লাহর হুকুমই একমাত্র প্রযোজ্য।" আল্লাহ বলেন- "আদেশের দিক থেকে কেউ আল্লাহর সাথে অংশীদার হতে পারেনা।"

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে একটি কথাই স্পষ্ট যে, আদেশ করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত। বরং প্রভূ মানে হচ্ছে যার এবাদত করা হবে। আর এবাদত একমাত্র অনুসরণ ও আদেশ মান্য করার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। প্রভূর আদেশ মান্য করা ছাড়া এবাদত কখনোই গ্রহণযোগ্য হবেনা। সুতরাং যে কোন ব্যক্তি নিজেকে অবৈধরূপে স্বয়ংসম্পূর্ণ আদেশকারী বা নিষেধকারী মনে করে, নিজেকেই একমাত্র হালাল-হারাম ধার্য করার মালিক মনে করে, তবে প্রকৃতঅর্থে সে নিজেকে প্রভূ বলে ঘোষণা দিল। আল্লাহ তা'লা বলেন- "নাকি তাদের কোন অংশীদার রয়েছে, যে আল্লাহর অঘোষিত বিষয়ে তাদেরকে সমাধান দিয়ে থাকে ??" এখানে আল্লাহ পাক সমাধানকারীকে অংশীদার বলে আখ্যায়িত করেছেন আর সমাধানকৃতকে ধর্ম বলে আখ্যা দিয়েছেন। দ্বীনের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে একনিষ্ঠতা, অনুসারী ব্যক্তিও অনুসৃতের একনিষ্ঠ হয়। এটাই দ্বীনের সঠিক অনুবাদ। সুতরাং আয়াতটি এখানে স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থবহনকারী। অর্থাৎ শরীয়তপ্রণেতাকে প্রভূ, শরীয়তকে দ্বীন আর অনুসারীকে অংশীদার অর্থেই নেয়া হবে। আল্লাহ তা'লা বলেন- "তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের ধর্মীয় গুরুজন ও পাদ্রীদেরকে প্রভূ বানিয়ে নিয়েছিল।" এর ব্যাখ্যায় হাদিসে বর্ণিত হয়েছে- আদী বিন হাতিম তাঈ থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. কে একদা নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়তে শুনলেন "আর তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের ধর্মীয় গুরুজন, পাদ্রী ও ঈসা বিন মারয়ামকে প্রভূ বানিয়ে নিয়েছিল। অথচ তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল একমাত্র আল্লাহর এবাদত করার জন্য। আল্লাহ ব্যতিত কোন মা'বূদ নেই। তাদের অংশীদারকৃত বিষয় থেকে আল্লাহ পবিত্র"। আদী বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো তাদের এবাদত করতাম না। উত্তরে নবী করীম সা. বললেন- আল্লাহ পাক যা হালাল করেছিলেন, তা তারা হারাম করেছিল না ? আল্লাহ পাক যা হারাম করেছিলেন, তারা তা হালাল করেছিলনা ? বলল- হ্যাঁ..! নবী করীম সা. বললেন- এটাই তো হচ্ছে এবাদত।

যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানাবলী ছেড়ে দিয়ে অন্য বিধানমতে সিদ্ধান্তগ্রহণ করে, তাদেরকে আল্লাহ পাক কাফের বলে সাব্যস্ত করেছেন- "আর যারা আল্লাহর বিধানমতে ফায়সালা করেনা, তারাই হচ্ছে কাফের।" আর যারা কুরআন-হাদিসের বিধান উপেক্ষা করে মানুষকে শাসন করে থাকে, তাদেরকে আল্লাহ তা'লা তাগুত বলেছেন- "আর ঐ সকল লোক তাগুতের (শয়তানের) বিধানমতে ফায়সালা করতে চায়, অথচ তাদেরকে তাগুত ছেড়ে দেয়ার আদেশ করা হয়েছিল। আর শয়তান সবসময় মানুষকে অন্ধকার পথভ্রষ্টতায় নিয়ে যেতে চায়।" ইমাম মুহাম্মদ আমীন শানকীতী "আযওয়াউল বায়ান" গ্রন্থে লিখেন- "আল্লাহর নাযিলকৃত শরীয়ত ব্যতিত অন্য যে কোন উপায়ে ফায়সালা করার নামই হচ্ছে তাগুত।"

আল্লাহ তা'লা বলেন- "ফায়সালা একমাত্র আল্লাহর জন্যই। আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, আল্লাহ ছাড়া তোমরা অন্য কারো এবাদত করতে পারবেনা। এটাই হচ্ছে সঠিক ধর্ম।" এখানে আল্লাহ তা'লা ফায়সালাকে এবাদত নামে ব্যক্ত করেছেন। আর ফায়সালাকৃত বস্তুকে ধর্ম বলেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি সর্ববিষয়ে আল্লাহর ফায়সালা জারী করল, সেই আল্লাহর এবাদত করল এবং আল্লাহর নাযিলকৃত বিষয়কে ধর্মরূপে গ্রহণ করল। আর যে ব্যক্তি তাগুতের ফায়সালা করল, প্রকৃতপক্ষে সে তাগুতের এবাদত করল এবং তাগুতের ফায়সালাকে নিজের ধর্ম বলে মেনে নিল।

শরীয়ত বিকৃতকারীদের ব্যাপারে উলামাদের অভিমত

উলামায়ে কেরাম এ সকল ভ্রান্ত মতবাদ ও কুফুরী শরীয়তের ব্যাপারে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন এবং এধরনের মতবাদ প্রতিষ্ঠাকারীদেরকে কাফের মুরতাদ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

ইবনে হাযম রহ. বলেন- "যে কোন মুসলমান যদি ইঞ্জিল কিতাবের বিধানমতে ফায়াসালা করে, যার কোন বিবরণ ইসলামী শরীয়তে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়নি, তাহলে সে কাফের তথা ইসলাম বহির্ভূত হয়ে যাবে।"

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন- "মুসলমানদের ধর্মে একটি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় হচ্ছে- যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অনুসরণকে ভাল মনে করল বা মুহাম্মাদ সা. এর উপর নাযিলকৃত দ্বীন ছেড়ে অন্য শরীয়তের অনুসারী হল, সে সকল মুসলমানের ঐক্যমতে কাফের হয়ে গেল।" তিনি আরও বলেন- "আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত শরীয়ত হচ্ছে কুরআনুল কারীম এবং রাসূলের কথা বা কাজকর্ম। আর এ শরীয়ত থেকে সৃষ্টির কোন বস্তুই বহির্ভূত নয়। একমাত্র কাফের ব্যতিত কেউ এ সীমানার বাইরে নয়।" অন্যত্র বলেন- "কোন মানুষ যদি সুস্পষ্ট হারামকে হালাল মনে করল বা সুস্পষ্ট হালালকে হারাম মনে করল বা সুস্পষ্ট শরীয়তকে পরিবর্তনে মনস্থ হল, সে সকল ফেকাহশাস্ত্রবিদের ঐক্যমতে কাফের।"

ইবনে কাছীর রহ. বলেন- "যে ব্যক্তি শেষনবী মুহাম্মাদ বিন আব্দিল্লাহ সা.এর উপর অবতীর্ণ সুস্পষ্ট শরীয়তকে উপেক্ষা করল এবং অন্য শরীয়তমতে ফায়সালা করল, সে কুফুরী করল।"

শেখ আব্দুল লতীফ বিন আব্দুর রহমান বলেন- "যে ব্যক্তি জেনেশুনে আল্লাহর নাযিলকৃত কোরআন ও রাসূলের বিধান বিরোধী ফায়সালা দিল, সে কাফের।"

শেখ আব্দুর রহমান বিন হুমাইদ বলেন- "যে ব্যক্তি ব্যাপকভাবে এমন শাসন প্রচলন করল, যা আল্লাহর বিধানের সাথে আপত্তি সৃষ্টি করে, তবে ইসলামের গন্ডি থেকে সে কাফের হয়ে বেরিয়ে গেল।"

শেখ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম বলেন- "সবচে' বড় কুফুরী হচ্ছে মানুষের তৈরি কোন সংবিধানকে মুহাম্মাদ সা. এর উপর অবতীর্ণ আল্লাহর সংবিধানের উপর প্রাধান্য দিল। অথচ আল্লাহ তা'লা বলেছেন- "যখন তোমাদের মাঝে কোন বিষয় নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়, তখন তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সিদ্ধান্তের দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যদি তোমরা আল্লাহ ও বিচারদিবসের উপর বিশ্বাস রেখে থাক। এটাই উত্তম পন্থা আর উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা।"

পারস্পরিক মতানৈক্য দেখা দেওয়ার প্রেক্ষিতে কুরআন-হাদিসমতে ফায়সালা করার পর আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানে যে সন্তুষ্ট হলনা, তাকে স্বয়ং আল্লাহ পাক সুনিশ্চিতরূপে ও শপথ করে কাফের বা বেঈমান হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহ পাক বলেন- "অতএব, আপনার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবেনা, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতপর আপনার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবেনা এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।" (সূরা নিসা- ৬৫)

উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে সবচে' বড় যে কুফুরী বিষয়টির ক্ষেত্রে আমাদের সমকালীন মুরতাদ ব্যক্তিবর্গ লিপ্ত রয়েছে তা হচ্ছে- "পঞ্চম সংবিধান, এ সংবিধানটি শরীয়তের সাথে সবচে' বেশি সংঘাতপূর্ণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সংবিধানের উপর কুঠারাঘাতকারী, মুসলমানদের জন্য খুবি হৃদয়বিদারক। সেটি হচ্ছে- আল্লাহর সংবিধানের সাথে তাগুতের বানানো সংবিধান মিশ্রণ করা, শয়তানী শরীয়তসমূহকে গলায় ঝুলিয়ে নেয়া। যেমন- ফ্রান্সের সংবিধান, মার্কিন সংবিধান, ব্রিটিশ সংবিধান ইত্যাদি। পাশাপাশি কতিপয় ভন্ড প্রতারকের দিকে এগুলো সম্মোদন করা। এ সকল তাগুতী শরীয়ত বর্তমানে বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে সামগ্রিকভাবে প্রচলিত। মুসলিম জনসাধারণ যাকে হরহামেশা মাথায় নিয়ে মিছিল-মিটিং করে অভ্যস্ত। এ শরীয়তের শাসকবর্গ আল্লাহর নাযিলকৃত মহাপবিত্র বিধানকে উপেক্ষা করে কতিপয় কাফের ভন্ড প্রতারকের তৈরি সংবিধানমতে দেশ শাসন করে যাচ্ছে। এটাকে শ্রদ্ধা করে জনসাধারণকে এর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, যা সবচে' বড় কুফুরী। মুহাম্মাদ সা.এর সাথে প্রকাশ্য ঠাট্টাবিদ্রূপ।

শেখ শানকীতী রহ. "আযওয়াউল বায়ান" গ্রন্থে লেখেন- "সবচে' আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে যে, আল্লাহর বিধানকে উপেক্ষাকারী এসকল ব্যক্তিবর্গই আবার ইসলামের দাবী করে। আল্লাহ তা'লা বলেন- "আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে সে বিষয়ের উপর তারা ঈমান এনেছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বিরোধীয় বিষয়কে শয়তানের দিকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি তা অমান্য করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বস্তুত শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্টতার গভীর অন্ধকারে নিয়ে যেতে চায়।" অন্যত্র আল্লাহ বলেন- "যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানমতে মীমাংসা করলনা, তারাই প্রকৃত কাফের।" অন্যত্র এরশাদ করেন- "তবে কি আমি আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য কোন বিচারক অনুসন্ধান করব, অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি বিস্তারিত গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন ? আমি যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করেছি, তারা নিশ্চিত জানে যে, এটি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্যসহ অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব, আপনি সংশয়কারীদের অন্তর্ভূক্ত হবেননা।"

শেখ শানকীতী রহ. আরও বলেন- এ ধরনের মিথ্যা শরীয়ত প্রণেতাদের অনুসারী ব্যক্তিবর্গ নিঃসন্দেহে মুশরেক বা আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্তকারী।

শেখ আহমদ শাকের রহ. বলেন- "ইসলামের শত্রুরা যে সকল মিথ্যা সংবিধান বিদ্বেষবশতঃ মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে, প্রকৃতপক্ষে এটি হচ্ছে একটি নতুন ধর্ম, যা মুসলমানদেরকে স্বচ্ছ ও মহামূল্যবাণ ধর্ম থেকে বঞ্চিত করার জন্য শত্রুপক্ষ ধার্য করে দিয়েছে। কারণ, তারা মুসলিম দেশগুলোকে এগুলো বাস্তবায়ে বাধ্য করে রেখেছে। মুসলমানদের অন্তরে এরপ্রতি ভালবাসা ও আকর্ষন গেঁথে দিয়েছে। এমনকি প্রায়ই গণমাধ্যমে বলতে শুনা যায়- সংবিধান সংশোধনী, বিচারবিভাগ পৃথককরণ, আদালতের রায় পরিবর্তন ইত্যাদি। কারণ এসকল বাক্য ইসলামী শরীয়ত এবং ফেকাহশাস্ত্রবিদদের সিদ্ধান্তে কখনোই প্রয়োগ করা যাবেনা। বরং ইসলামী শরীয়তের উপর তারা ইতিমধ্যেই লেবেল লাগিয়ে দিয়েছে- মধ্যযুগীয় ব্যাপার, পুরাতন বিচারব্যবস্থা, মৌলবাদী শাসন ইত্যাদি।" তিনি আরও বলেন- "এ সকল শাসনে প্রয়োগকৃত সকল সংবিধানই সূর্যের আলোয় ন্যায় স্পষ্ট, এটা প্রকাশ্য কুফুরী মতবাদ, যেখানে অস্পষ্টতা বলতে কিছু নেই। মুসলমান নামধারী যে সকল ব্যক্তিবর্গ এর সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত রয়েছে, তারা যেই হোকনা কেন, কোন অজুহাত তাদের থেকে গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নিজের বিষয়ে সতর্ক থাকে। কারণ, বিচারদিবসে প্রত্যেককেই কিন্তু কাঠগড়ায় দাড়াতে হবে।

শেখ মুহাম্মাদ হামিদ ফাক্বী বলেন- "সালফে সালেহীনের বক্তব্যের সারমর্ম হল- তাগুত বলা হয় প্রত্যেক ঐ বস্তু, যা বান্দাকে আল্লাহর এবাদত থেকে বিমুখ করে দেয়। একনিষ্ঠভাবে দ্বীন পালন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণে বাধা সৃষ্টি করে। চায় তা জ্বীন শয়তান হোক বা মানুষ শয়তান হোক বা কোন বৃক্ষ-পাথর হোক। যদি তাই হয়, তবে আমাদের মুসলিম সমাজের সববিভাগে প্রচলিত বর্তমান বিচারব্যবস্থাও তাগুতের অন্তর্ভূক্ত হবে, যা সম্পূর্ণ অমুসলিমদের বানানো সংবিধান। কারণ, এর মাধ্যমে প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর বিধানকে বাতিল করে দেয়া, যা হদ কায়েম করা, সুদ হারাম হওয়া, ভ্যাবিচার নিষিদ্ধ হওয়া, মদ্যপান নিষিদ্ধ হওয়াকে সন্নিবেশিত করে। বর্তমান গণতন্ত্রে প্রচলিত সংবিধানে উপরোক্ত সবগুলো বিষয়কেই অগ্রাহ্য করে। সুতরাং মূল সংবিধানকেই তাগুত বলা হবে। পাশাপাশি এর প্রবক্তা এবং সহযোগীতাকারী সকলেই তাগুত।"

এভাবেই আমরা বুঝতে পারি যে, বর্তমান মুসলিম বিশ্বে প্রচলিত বিচারব্যবস্থাটি তাগুতী বিচারব্যবস্থা। আমাদের শাসকবর্গ তাগুতী শাসকবর্গ; বরং তারা কাফেরদের চাইতেও ভয়ংকর। কেননা, তারা কেবল শয়তানী শরীয়ত প্রচলিত করেই ক্ষান্ত হয়নি, উপরন্তু প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে যে, শাসন ও বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'লার কোনই অধিকার নেই। কারণ, প্রতিটি রাষ্ট্রীয় সংবিধানেই স্পষ্ট করে লেখা আছে যে, জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। এখানে 'ক্ষমতা' বলতে সর্বপ্রকার ক্ষমতা উদ্দেশ্য। আর ইসলাম ধর্মমতে ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। তারা ক্ষমতার মাধ্যমে এখানে সবধরনের কথা এবং কাজে প্রয়োগক্ষমতাকে বুঝে থাকে। অর্থাৎ তারাই হালালকরণ বা কোন কিছু হারামকরণের ক্ষমাতাবান। আর এটাই পালনকর্তার প্রকৃত অর্থ, যার বর্ণনা পূর্বে গত হয়েছে।

যে সকল সরকার সংবিধান না লিখে কোরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার দাবী করে, তাদের উদ্দেশ্যে আমরা বলবঃ-

"তোমাদের দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং প্রতারণামূলক"। কারণ, তোমাদের বাস্তবতাও ঐ সকল রাষ্ট্রের বাস্তবতার ন্যায়, যারা সংবিধান লিপিবদ্ধ করে রাষ্ট্র চালাচ্ছে। সুতরাং তোমাদের পারস্পরিক সামঞ্জস্যতা হচ্ছে দুই কাকের সামঞ্জস্যতার ন্যায়। অতপর ধারণা করেছ যে, তোমরা জনগণের হাতে ক্ষমতা অর্পন করনি এবং এটাও বলনি যে, সকল ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর। তোমরা এখানে নাম পাল্টিয়ে পার্লামেন্ট বসিয়েছ। এভাবে তোমরাও অন্যদের ন্যায় বিভিন্ন কুফুরী ইউনিয়নকে কাছে ভিড়িয়েছ। এ্যারাবিক ইউনিভার্সিটি এবং জাতিসংঘের মত কুফুরী সংগঠনে প্রবেশ করেছ। অতপর তাদের ধার্যকৃত কুফুরী সংবিধানকে স্বরাষ্ট্রে চালু করে আল্লাহর হারামকৃত বস্তুসমূহকে হালাল ও হালালকৃত বস্তুকে হারাম বানিয়েছ। এভাবে তোমরা শুধু নাম পরিবর্তন করে হুবহু ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করেছ। চিরাচরিত হারাম সুদকে তোমরা হালাল বানিয়েছ। এভাবে তোমরা প্রতিটি মুসলমানকে আজ সুদী

কারবারীতে যুক্ত করিয়েছে। মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি ব্যাংকেই আজ সুদী সিস্টেম প্রচলিত। তোমরাই জবাব দাও- কোন সংবিধান তোমাদেরকে এগুলো করার অনুমতি দিয়েছে ?? বরং ইসলামী ব্যাংক নামের এই নতুন রাজ্যই তোমাদেরকে এগুলো থেকে নিষেধ করবে।

হে মুসলিম ভাই! এভাবেই আপনি দেখবেন যে, আমাদের এই পবিত্র রাষ্ট্রগুলো মুরতাদ ও কুফুরী সরকারের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। শাসকের বেশে বসে আছে সব মুরতাদ আর মুনাফিক। উপরোক্ত কুফুরী সংবিধানকে তারা একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্ম হিসেবে চালু করে জোরপূর্বকভাবে মানুষকে এর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি এই সকল মুনাফিক শাসকই আল্লাহর শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে মুসলমানদেরকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। আপনি সকল সরকারকেই দেখবেন যে, তারা মুশরেকদেরকে বন্ধু বানিয়ে তাদেরকে সহযোগীতা করে থাকে, তাদের উপর বিপদ আবর্তিত হলে দুঃখে ফেটে যেতে থাকে। তাদের দেশে কখনোই ঐ সকল কাফেরকে গালমন্দ করার অনুমতি হয়না বা প্রকাশ্যে তাদের বিরোদ্ধে বিক্ষোভ করার অনুমতি হয়না। মুশরেকদের গালমন্দকারীদের বিরোদ্ধে সংবিধানে কঠোর শাস্তির বিধান করা হয়েছে। মুশরেকদের সাথে তাদের বন্ধুত্বের প্রধান নিদর্শন হচ্ছে যে, অভিন্ন ধর্মের প্রমাণস্বরূপ তাদের সাথে তারা নিরাপত্তা ও সামরিক চুক্তি করে রেখেছে। যে কোন ভাবে পারস্পরিক সহযোগীতাই হচ্ছে বন্ধুত্বের প্রধান নিদর্শন। আল্লাহ তা'লা বলেন- "হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদী এবং খৃষ্টানদেরকে কখনো বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা। কেননা, তারাই পরস্পরে বন্ধু। আর যারাই তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে, তারা ওদের মধ্যে বলেই বিবেচিত হবে। নিশ্চয় আল্লাহ তা'লা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে হেদায়েত দেননা।"

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত তাফসীরবিশারদ ইবনে জারীর রহ. বলেন- "সুতরাং যারাই মুমিনদের বিরুদ্ধে তাদেরকে বন্ধু বানিয়ে কোন প্রকার সহযোগীতা করবে, তারা ওদেরই ধর্মে আছে বলে বিবেচিত হবে। কারণ, সমধার্মিক ব্যক্তিই একমাত্র তার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারে। বন্ধুত্বের মানেই হল যে, সে ঐ ব্যক্তির ধর্মের উপর সন্তুষ্ট আছে। আর কুফুরীর উপর সন্তুষ্ট মানেই হল আল্লাহর বিধানের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচারণ। সুতরাং তার প্রতি তাদের মতই বিধান আরোপ করা হবে।"

এভাবেই আমরা বুঝতে পারলাম যে, ঐ সকল শাসকবর্গ প্রকাশ্য কুফুরীর মধ্যে লিপ্ত। কারণ, তারাই মুসলমানদের চিরশত্রুইহুদী খৃষ্টানদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিধর্মীদের সাথে তাদের বন্ধুত্বের প্রধান নিদর্শন হচ্ছে যে, তারা নির্দ্বিধায় মুশরেকদের সার্বিক অনুসরণ মেনে নিয়েছে, মুশরেকদের শরীয়তে সন্তুষ্ট হয়েছে, বিভিন্ন কুফুরী ও শয়তানী সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়েছে যাদের একমাত্র শ্লোগানই হচ্ছে- "ধর্মের দিক দিয়ে মানুষের মাঝে কোনই পার্থক্য নেই"। এভাবে তারা মুসলমান এবং মুশরেকের মাঝে সমঝোতা সৃষ্টি করে ইহুদীদের তৈরি অভিন্ন ধর্মের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে। অথচ আল্লাহ তা'লা মুশরেকের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে স্পষ্ট নিষেধ করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন- এ ধরনের কর্মকান্ড আল্লাহ তা'লার অসন্তুষ্টির কারণ। আল্লাহ তা'লা বলেন- "বাপ-ভাই যদি ঈমানের বিপরীতে কুফুরীতে সন্তুষ্ট থাকে, তবে তাদেরকেও বন্ধু বা শুভাকাঙ্খী মনে করনা। যারাই বিধর্মীদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে, তারাই প্রকৃত জালেম।" এই আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ তা'লা পিতা এবং সহোদর মুমিন ও কাফের দুই ভাইয়ের মাঝে স্পষ্টভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছেন। সুতরাং অপরিচিত কোন কাফেরের সাথে যদি বন্ধুত্ব স্থাপন করে, তবে তার কি অবস্থা!! এভাবেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, জাতিয় ভ্রাতৃত্ববোধের নামে মুসলিম দেশগুলোতে যা কিছু হচ্ছে, সবই ভ্রষ্টতা ও কুফুরীর নিদর্শন। কেননা, ঐ সকল মুরতাদের তৌরী সংবিধানে স্পষ্ট করেই লেখা আছে যে, দেশের নাগরিক হিসেবে সবাই সমাধিকার পাবে। এখানে ধর্ম বা আক্বীদার ক্ষেত্রে কোন ভেদাভেদ করা যাবেনা। তারা বলে থাকে যে, ধর্ম একমাত্র আল্লাহর জন্য আর দেশ সকল জনগণের জন্য। এর মানে হচ্ছে- ধর্মের দিক থেকে দেশের নাগরিকদের মাঝে কোন বৈষম্য সৃষ্টি করা যাবেনা। একজন নাগরিক হিসেবে মুসলমান এবং কাফের সকলেই তাদের চোখে সমান। অথচ স্বয়ং আল্লাহ তা'লা কাফেরের সাথে বন্ধুত্বস্থাপনকারীকে কাফের বলে আখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'লা বলেন- "আর যারা কাফের, তারা পরস্পরে একজন অপরজনের বন্ধু।" নবীদেরকে আল্লাহ দুনিয়াতে যে মিশন দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, তার মূল উদ্দেশ্যই ছিল মুশরেকদের থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করা। যেমন- ইবরাহীম আ. সম্পর্কে আল্লাহ তা'লা বলেন- "তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল- তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যার এবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানিনা। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে।"

এরপর তাকিয়ে দেখেন- অভিশপ্তরা নিরীহ মুসলমান আর আল্লাহর পথের আহবানকারীদের সাথে কিরূপ আচরণ করেছে। তাদের শরীরে লোহার শিকল ঝুলিয়েছে, কারাগারগুলোকে তাদের মাধ্যমে পূর্ণ করেছে, তাদেরকে দেশান্তর করেছে। বর্তমানে মুসলমানদের সকল দেশগুলোতেই আল্লাহর পথে আহবানকারীকে কঠিন মুহুর্তের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাদের কারাগারে নিয়ে নির্মমভাবে শাস্তি দেয়া হচ্ছে, হত্যা করে দেয়া হচ্ছে। তাদের দোষ একমাত্র এটাই ছিল যে, তারা মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল। তারা মুসলমান যুবকদেরকে দেশান্তর করে দেশ পবিত্র করার শ্লোগান দিচ্ছে। ঠিক যেমনটি কওমে লূত বলেছিল- "তাদেরকে (মুমিনদেরকে) তোমাদের এলাকা থেকে বের করে দাও, কারণ তারা পবিত্রতা অবলম্বন করতে চায়।"

এসকল কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়ে মুসিলম রাষ্ট্রগুলোর শাসকবর্গ ইসলামের গন্ডি থেকে বেরিয়ে গেছে, যা বর্তমান সময়ে কোন মুসলমানের অজানা থাকার কথা নয়।

কাযী ইয়ায রহ. বলেন- "উলামায়ে কেরাম ঐক্যমত হয়েছেন যে, একজন কাফের ব্যক্তি কখনোই নেতা হতে পারেনা। এমনকি কোন শাসক যদি কুফুরী কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়, তবে তাকে পদচ্যুত করা আবশ্যক। ঠিক তদ্রূপ যদি শাসক নামায কায়েম না করে, বা নামাযের দিকে জনগণকে আহবান না করে, তবেও তাকে পদচ্যুত করা অপরিহার্য।

এ ধরনের জ্ঞানের কি দরকার ? একজন মুসলমান হিসেবে ঐ সকল তাগুতী শাসককে কাফের বলা ওয়াজিব ??

উত্তর হবে হ্যাঁ..! প্রত্যেক মুসলমানকে একথা জেনে রাখা আবশ্যক যে, নাস্তিক কাফেরদেরকে কাফের বলে সাব্যস্ত করা মুসলমানদের প্রধান আক্বীদা।

মুসলমান হিসেবে তাহলে আমার দায়িত্ব কি হতে পারে ??

আপনার উদ্দেশ্যে বলছি যে, হে ভাই! ভাল করে জেনে রাখুন- ঐ সকল তাগুতী শাসক থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করা সর্বপ্রথম আপনার উপর ফরযে আইন। কারণ, আপনি পূর্বেই জেনে এসেছেন যে, ঈমানের একটি মৌলিক স্তম্ভ হচ্ছে সকল প্রকার কাফের সম্প্রদায় থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করা, তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা, তাদের প্রতি কোন সৌহার্দ্যতা না রাখা।

আমাদের ইমামগণ বলেন যে, নাস্তিকদেরকে কাফের সাব্যস্ত করা ইসলাম ধর্মের একটি আবশ্যকীয় বিষয়। সুতরাং কোন মুসলমানের জন্য তাদেরকে সহযোগীতা করা অথবা তাদের ধার্যকৃত কোন সংগঠনে নিজেকে জড়িত করা অথবা সামরিকভাবে ও গণমাধ্যমের সাহায্যে তাদেরকে সমর্থন করা জায়েয হবেনা। এধরনের কোন সংগঠনে জড়িত হয়ে যারাই তাদেরকে সাহায্য করবে, তারাই আল্লাহ পাকের এই উক্তির অধীনে পড়ে যাবে- "আর

যারাই তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে, তারাও তাদের মধ্যে বলে বিবেচিত হবে।" কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে তারাও যদি কাফের হয়ে যায়, তবে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাও ফরয হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'লা বলেন- "আর যারা ঈমানদার, তারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে। পক্ষান্তরে যারা কাফের, তারা তাগুতের রাস্তায় যুদ্ধ করে। সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদেরকে হত্যা করা, কারণ শয়তানের চক্রান্ত নিতান্তই দুর্বল।" অন্যত্র আল্লাহ বলেন- "আর কিছুতেই আল্লাহ তা'লা কাফেরদেরকে মুসলমানদের উপর বিজয় দান করবেননা।" সুতরাং তারা হচ্ছে কাফের শাসক, তাদের থেকে সার্বিক বন্ধন ছিন্ন করতে হবে, তাদের অনুসরণ ত্যাগ করে আল্লাহর আদেশের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে।

তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আবশ্যক

তাদের বিরুদ্ধে নিজেকে মুক্ত ঘোষণার মানেই হল লড়াইয়ের ঘোষণা দেয়া। কারণ, কোন শাসক যদি কুফুরী করে এবং আল্লাহর শরীয়তের বহির্ভূত কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়, তাহলে তাকে পদচ্যুত করা পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে লড়াই করা ফরয। তাকে অপসারণ করে কোন খাঁটি ঈমানদারকে স্থলাভিষিক্ত করা আবশ্যক। উবাদা বিন সামেত রা. থেকে বর্ণিত, একদা নবী করীম সা. আমাদেরকে ডেকে বায়আত নিলেন। বায়আতের বিষয়বস্তু ছিল- সুখে দুঃখে, স্বচ্ছল মূহুর্তে বা কঠিন মুহুর্তে সবসময় আমরা (আমীরের কথা) শুনব আর মানব। কখনো গন্ডগোল সৃষ্টি করবনা। তবে হ্যাঁ... যদি তোমরা প্রকাশ্য কোন কুফুরী লক্ষ কর যা স্পষ্টরূপে আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে যায় (তবে তা অপসারণ করা তোমাদের উপর ফরয)।

ইমাম নববী রহ. বলেন- "কাযী ইয়ায রহ. বলেছেন- উলামায়ে ইসলাম ঐক্যমত হয়েছেন যে, কোন কাফের নেতৃত্বের যোগ্য হতে পারবেনা। যদি কোন শাসক কুফুরীতে লিপ্ত হয়, তবে তাকে অপসারণ করা আবশ্যক। ঠিক তদ্রূপ যদি নামায কায়েম বা নামাযের দিকে আহবান ছেড়ে দেয়, তাহলেও তাকে অপসারণ করা আবশ্যক। কাযী ইয়ায বলেন- কোন শাসকের কাছ থেকে যদি কুফুরী কার্যকলাপ প্রকাশ পায় বা শরীয়ত পরিবর্তনের মত কোন নিদর্শন পরিলক্ষিত হয় বা কোন কুসংস্কার দেখা যায়, তবে সে শাসকের অধিকার হারিয়ে ফেলবে। এভাবে সমস্ত মুসলমানের উপর তার অনুসরণ বিনষ্ট হয়ে যাবে। তখন মুসলমানদের উপর ফরয হচ্ছে তাকে অপসারণ করে তার স্থলে ন্যায়পরায়ণ একজন নেতাকে নিযুক্ত করা। যদি তা করতে কোন মুসলমান অপারগ হয়ে যায়, তাহলে তার জন্য আবশ্যক হচ্ছে মুসলমানদের কোন ভূমিতে হিজরত করা, দ্বীন নিয়ে অন্য কোথাও পালিয়ে যাওয়া।

ইবনে হাজার রহ. বলেন- "ইবনে তীন বলেছেন- উলামায়ে কেরাম একমত হয়েছেন যে, কোন শাসক যদি কুফুরী বা কোন কুসংস্কারের দিকে আহবান করে, তবে তাকে পরিবর্তন করে অন্য কাউকে শাসক বানাতে হবে। ইবনে হাজার রহ. বলেন- এর সারকথা হচ্ছে যে, কুফুরীর দরুন সর্বসম্মতিক্রমে তাকে পদচ্যুত করা হবে। তাকে অপসারণ করার ক্ষেত্রে সমস্ত মুসলমানকে একসাথে কাজ করতে হবে।"

উলামায়ে কেরামের উপরোক্ত মতামতের ভিত্তিতে আপনি অবশ্যই জেনে থাকবেন যে, কোন মুসলমানের জন্য কখনো কোন কাফেরের শাসনে সন্তুষ্ট থাকা জায়েয নয়। বরং মর্যাদা একমাত্র আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদের জন্য অবধারিত। কোন কাফেরের সামনে মুসলমানকে মাথা নত করার মানেই হচ্ছে লাঞ্ছনার যাপনে তুষ্ট হওয়া, যা একজন মুমিনের জন্য কখনোই বাঞ্ছনীয় নয়।

হে মুসলিম ভাই! (আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করুন) আমাদের ইসলাম ধর্মে মুরতাদের পরিণতি একজন মৌলিক কাফেরের চেয়েও কঠোর ঘোষিত হয়েছে। ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন- "মুরতাদ ব্যক্তির কুফুরী সর্বসম্মতিক্রমে মৌলিক কাফেরের কুফুরী অপেক্ষা মারাত্মক ও ভয়ানক।" তিনি আরও বলেন- "কুরআনের সংবিধানে কয়েকটি কারণে মুরতাদের শাস্তি কাফেরের শাস্তি থেকেও বেশি হওয়ার কথা ঘোষিত হয়েছে- এক- মুরতাদের কাছ থেকে কখনো জিযয়া গ্রহণ করা বৈধ নয়; বরং সর্বাবস্থায় তাকে হত্যা করা ফরয। কিন্তু মৌলিক কাফের (লড়াইহীন) এর বিপরীত। কারণ, অধিকাংশ ইমামদের মতে (যেমন আবূ হানীফা, মালেক, আহমদ রহ.) তাকে হত্যা করা যাবেনা। কিন্তু মুরতাদকে সর্বসম্মতিক্রমে হত্যা করা হবে। দুই- মুরতাদ কখনোই মুসলমানের উত্তরাধীকারে অংশীদার হতে পারবেনা। মুরতাদের সাথে মেয়ে বিবাহ দেয়া যাবেনা। মুরতাদের যবাইকৃত পশু বক্ষণ করা যাবেনা।

ইমাম আহমদ রহ. বলেন- মুরতাদকে কখনোই নিরাপত্তা (ভিসা) দেয়া যাবেনা। "জামেউল খিলাল" গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, আছরাম বর্ণনা করেন- যিন্দিক সম্পর্কে আবূ আব্দুল্লাহর কাছে প্রশ্ন করার পর আমি তাকে বলতে শুনেছি যে, যিন্দিকের কাছ থেকে কখনোই জিযয়া নেয়া যাবেনা; বরং যেখানেই তাকে পাওয়া যাবে, হত্যা করতে হবে। ইসলামে যিন্দিকের কাছ থেকে জিযয়া নেয়ার কোন বিধান নেই। অতপর বলেন- ছুবহানাল্লাহ ! (আশ্চর্যের ভঙ্গিতে...) যিন্দিকের কাছ থেকে জিযয়া নেয়া হবে ?? (আরও আশ্চর্যের ভঙ্গিতে...)

উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে মুরতাদকে দাফন করা যাবেনা

ইসহাক বিন মানসূর রহ. বলেন- "আমি ইমাম আহমদকে প্রশ্ন করলাম- মুরতাদকে হত্যা করার পর তার লাশকে কি করা হবে ? উত্তরে ইমাম আহমদ বললেন- বলা হয় যে, তার লাশকে ঐ স্থানেই ফেলে রাখা হবে, যেখানে হত্যা করা হবে। ওটাই তার কবরস্থান। এটাই আমার কাছে সর্বোত্তম মতামত।

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন- "মুরতাদ প্রকাশ হওয়ার পর আবূ বকর সিদ্দীক এবং সকল সাহাবায়ে কেরাম রা. কাফেরদের ছেড়ে সর্বপ্রথম মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। মুরতাদকে হত্যা করা মুসলমানদের ঈমান-আক্বীদা রক্ষার শামিল। বহির্শত্রুদের সাথে যুদ্ধের পূর্বে আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি যাচাই করে নিতে হবে। একটি কথা ভাল করেই জেনে রাখা দরকার যে, ব্যবসার ক্ষেত্রে মূলধন হচ্ছে লাভের উর্ধ্বে। মূলধন রক্ষিত থাকলে লাভের আশা করা যাবে। মূলধন নষ্ট হয়ে গেলে লাভের আশা করা বোকামী।

সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক হবে অপসারণ করা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া, সাধ্যমত যুদ্ধের সরঞ্জামাদী সংগ্রহ করে পরিপূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করা, মুসলমানদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত ভূমিগুলোকে ইসলামের পূর্ণ শাসনের দিকে নিয়ে আসা। মুরতাদ অভিশপ্ত শাসকেরা এসে আল্লাহর আইন বিবর্তন করে শরীয়ত বিনষ্ট করে ফেলেছে, মুশরেকদের অপবিত্র শয়তানী কর্তৃত্বকে আসার সুযোগ দিয়েছে।

উম্মতে ইসলামের প্রতি হিংসা ও শয়তানী শরীয়তের অনুসরণকরতঃ এই সকল মুনাফিক শাসকবর্গ যমিনে ফ্যাসাদ ছড়িয়ে দিয়েছে। অথচ আল্লাহ পাক মুমিনদেরকে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদের আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'লা বলেন- "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে সংগ্রাম করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিস্কার করা হবে। এটি হল তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।"

আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার উপকরণসমূহ তাদের কথা আর কার্যকলাপে পরিলক্ষিত হয়েছে। ইসলামী শরীয়ত বহির্ভূত বিষয় তাদের দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে। কুরআন-সুন্নাহর আইনের প্রতি তোয়াক্কা না করে যমিনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং প্রতিটি মুসলমানের জন্য এই মুহুর্তে স্বদেশকে কুফর ও শেরক থেকে মুক্ত করা আবশ্যক।

কাজটি আগামীকাল নয়; বরং আজকেই সমাধা করতে হবে। কারণ প্রতিনিয়ত তাদের কর্মকান্ডগুলো ইসলামের জন্য অভিশাপ হয়ে আসছে। প্রতি মুহুর্তে মানুষ ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কতিপয় জ্ঞানী লোক মনে করে যে, তাদের বিরুদ্ধে ধীরেচিত্তে পদক্ষেপ নেয়াই বুদ্ধিমানের পরিচয় হবে। বরং সঠিক পন্থা হচ্ছে যে, ঈমানদারদেরকে দাওয়াত এবং জিহাদের অস্ত্র ব্যবহার করে যত দ্রুত সম্ভব এই সকল মুরতাদকে উৎখাতের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। আপনি অবশ্যই দেখে থাকবেন যে, এই মুরতাদ শাসকদের তথ্য মন্ত্রণালয় মুসলমানদের মাঝে কিরূপ নাস্তিকতাপূর্ণ মতবাদ ছড়িয়ে দিচ্ছে। অপমান ও লাঞ্ছণাকে মুসলমানদের নিত্যদিনের সঙ্গী বানিয়ে দিয়েছে। যিনা ব্যাভিচারকে মিডিয়ার মাধ্যমে আধুনিক রীতি হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। সর্বোপরি ইসলামের মত পবিত্র ধর্মকে মিটিয়ে নাস্তিক্যবাদী ধর্মের দিকে আহবান করা হচ্ছে।

আপনি অবশ্যই দেখে থাকবেন যে, খাদ্য ও ধর্মমন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কত হারাম বস্তুকে হালাল হিসেবে বাজারে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। মুসলমানদেরকে ধর্মীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। ইসলামের প্রতিটি বিষয় নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা হচ্ছে। নারীদের পবিত্র সম্ভ্রম হিজাবের বিরুদ্ধে নিন্দা ও কঠোরতা আরোপ করা হচ্ছে। সুতরাং আছে কি কোন ন্যায়বান যুবক, যার বলিষ্ঠ তরবারী এ সকল নাস্তিক মুরতাদদেরকে সরল পথে ফিরিয়ে আনতে পারবে ??

আপনি দেখে থাকবেন যে, অর্থ মন্ত্রণালয় প্রতিদিন অবুঝ মুসলমানদের মুখে সুদের বিষ ঢেলে দিয়ে তাদেরকে আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধের কাতারে দাড় করাচ্ছে। কেহই আজ সুদী ব্যাংকে টাকা জমা ছাড়া নিজের সম্পদ সংরক্ষণ করতে পারছেনা। সুদী সিস্টেম ছাড়া কেহ ব্যবসায় লভ্যাংশ গুনতে পারছেনা। তারা প্রতিনিয়ত যে সকল ক্ষুদ্র ঋণের কথা বলে দরিদ্র লোকদেরকে সুখসমৃদ্ধ জীবনের স্বপ্ন দেখিয়ে থাকে, তাও এই সুদী সিস্টেম থেকে মুক্ত থাকছেনা। বাধ্যতামূলক বীমা বা ইনস্যুরেন্সের বেসে মানুষের জীবনকে নির্দিষ্ট বিষয়ের সাথে বেঁধে ফেলা হচ্ছে।

আপনি দেখে থাকবেন যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের হাতে কিরূপ শিক্ষা তুলে দিচ্ছে। এই বিজাতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মুসলমানদের সন্তানেরা নাস্তিকতার দিকে ধাবিত হয়ে যাচ্ছে। এখন বিষয়গুলো আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে, শুকর বানরের ছেলেদের (ইহুদী) সাথে তারা বিভিন্ন শান্তিচুক্তি স্থাপন করে মুসলমানদের ইজ্জত সম্ভ্রম ও নিরাপত্তাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিচ্ছে। আপনি অন্যান্য ইউনিভার্সিটি বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দিকে তাকান এবং তাদের শিক্ষা এবং আল্লাহর নাযিলকৃত শিক্ষাকে এক পাল্লায় মাপেন। তাহলেই এই সকল ভন্ড নাস্তিক মুরতাদের চেহারা আপনার চোখে আয়নার মত পরিস্কার হয়ে যাবে।

এরপরও কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে মুসলমানদের কোন আপত্তি থাকতে পারে ?? অথচ আল্লাহ তা'লা বলেন- "আর যুদ্ধ কর যতক্ষণ না ফেতনা সম্পূর্ণ নির্মূল হয়ে যায় এবং পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।" এখন চিন্তা করুন, আমাদের দেশের ধর্ম কি আল্লাহর ধর্ম ?? নাকি সম্পূর্ণই শয়তানের ধর্ম। খুব কমই পাবেন যেখানে ইসলামী শরীয়ত থেকে কোন কিছু নেয়া হয়েছে। কিছু দ্বীন আল্লাহর জন্য আর কিছু দ্বীন গায়রুল্লার জন্য তা তো হতে পারেনা। সুতরাং পরিপূর্ণ আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি মুসলমানকে যুদ্ধ করা আবশ্যক।

শেষকথা

আমরা জিহাদ করে যাচ্ছি। কারণ, জিহাদই হচ্ছে উম্মতকে সম্মানের দিকে ফিরিয়ে নেয়ার একমাত্র পথ। নবী করীম সা. বলেন- "যখন তোমরা ধোকার ক্রয়বিক্রয় করবে, গরুর লেজ ধরে ঘরে বসে যাবে, ক্ষেতখামার নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে জিহাদকে ছেড়ে দেবে, তখন আল্লাহ পাক তোমাদের উপর এমন লাঞ্ছণা চাপিয়ে দেবেন, পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর দ্বীনে ফিরে না আসা পর্যন্ত সেই লাঞ্ছণা তোমাদের থেকে উঠাবেননা।" এখানে দ্বীন বলতে জিহাদ উদ্দেশ্য।

আমরা জিহাদ করে যাচ্ছি কারণ, জিহাদ হচ্ছে জীবন। আল্লাহ তা'লা বলেন- "তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দাও। আল্লাহ তোমাদেরকে জীবন দান করবেন।" মুফাচ্ছীরীন বলেছেন- এখানে জীবন বলতে জিহাদ উদ্দেশ্য।

যদি বলা হয়- আরেকটু ধৈর্য্য ধর..!!

জেনে রাখবেন, আল্লাহ কখনো চাননা যে, মুসলমান একটি মুহূর্ত অপমানের সাথে জীবন যাপন করুক। কারণ, আল্লাহ বলেছেন, "মর্যাদা ও সম্মান একমাত্র আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদের জন্য অবধারিত।" অন্যত্র বলেন, "কিছুতেই আল্লাহ তা'লা কাফেরদেরকে মুমিনদের উপর বিজয় দান করবেননা।"

যদি বলা হয়- জিহাদ হচ্ছে ফেতনা.. !!

প্রতি উত্তরে আপনি তাকে আল্লাহর বাণীটি শুনিয়ে দেবেন- "তাদের কেউ বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন, আমাকে ফেতনায় ফেলবেননা। শোনে রাখ! তারা পূর্বে থেকেই ফেতনায় পড়ে রয়েছে এবং নিঃসন্দেহে জাহান্নাম এই কাফেরদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে।"

জিহাদ কেন ফেতনা হবে ? অথচ জিহাদই সকল ফেতনাকে নির্মূল করে। আল্লাহ বলেন- "যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না ফেতনা সম্পূর্ণ নির্মূল হয়ে যায়।"

যদি বলে, জিহাদ তো মৃত্যু ঘটায় ...!!!

বলবেন, মৃত্যুর জন্যই তো জিহাদ করছি। কারণ, জিহাদ করতে গিয়ে মৃত্যু হলে শাহাদতের মর্যাদা পাওয়া যাবে। আর শাহাদাতই প্রতিটি মুজাহিদের সর্বোচ্চ বাসনা। আল্লাহ বলেন- "মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি।" অন্যত্র বলেন- "আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করোনা; বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত।"

যদি বলা হয়, তুমি তো এ পথে একা ! সাথে কেউ নেই ! মানুষ তো নিজেদের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত !

উত্তরে বলব- এটাই হক্বপন্থীদের নিদর্শন। হক্বপন্থী সম্প্রদায় প্রতিটি যুগেই অপরিচিত থেকেছে। আল্লাহ তা'লা বলেন- "আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন! আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের যিম্মাদার নন! আর আপনি মুমিনদেরকে উৎসাহিত করতে থাকুন। শীঘ্রই আল্লাহ কাফেরদের শক্তি-সামর্থ খর্ব করে দেবেন। আর আল্লাহ শক্তি-সামর্থের দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন শাস্তিদাতা।" এর ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন- এটা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীকে সম্মোদন করে আদেশ যে, মুনাফিকদের কটুক্তিকে আপনি পরোয়া করবেননা। বরং সাথে কেহ না থাকলেও সঠিকরূপে আপনি আপনার যুদ্ধ চালিয়ে যান।

ওহে প্রিয় মুসলিম ভাই! আপনার মনে উদয় হওয়া কিছু প্রশ্নমালা এবং উত্তর নিয়ে এই ছিল আমাদের ছোট্ট আয়োজন। আশা করি উত্তর পেয়েছেন, আমরা কারা ?? কি চাই ?? আর জিহাদেরই বা প্রয়োজন কি ?? সুতরাং আসুন...!! আল্লাহর দেয়া এই মহা আমানত রক্ষায় আমাদের সাথে শরীক হয়ে যান...!! সত্য জানার পরেও আর বসে থাকবেননা...!!! আল্লাহ তা'লা বলেন- "তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও যমীন, যা তৈরি করা হয়েছে পরহেযগারদের জন্য।"

প্রশংসা সবি কেবল তোমারি রাব্বুল আলামীন....!!!